বাইরের কার্পেট শিল্পে বাংলার মহিলারা

কার্পেট গালিচা শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পাশ্চাত্য দেশ ছাড়া ভারতবর্ষে কার্পেটের আগমন ঘটে মোঘল সম্রাট আকবরের হাত ধরে। পারস্য থেকে কিছু কার্পেট শিল্পীকে তিনি নিয়ে আসেন দিল্লী। ফলত উত্তর প্রদেশে গড়ে ওঠে কার্পেট শিল্পের কারখানা ও জন্ম নেয় দেশীয় শিল্পীর। উত্তরপ্রদেশের ভদোহিতে এখনও তৈরী হচ্ছে কার্পেট। তবে রাজস্থান বা কাশ্মীরের যে কার্পেট তার সাথে ভদোহির কার্পেটের কিছুটা পার্থক্য আছে। কার্পেট প্রধানত রাজা মহারাজা সম্রাটদের বিলাসবহুল জীবনের পরিচয় বহন করে। কার্পেটের মোলায়েম সৌখিনতা আজও আকৃষ্ট করে মানুষকে।

বর্তমানে বঙ্গদেশেও তৈরী হচ্ছে কার্পেট। তৈরী করছে অগুনিত মহিলা। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও হোক বা হোক পূর্ব মেদনীপুর জেলার ব্রজবল্লভপুর, রসিকপুর, রাধাবল্লভপুরচক, নিশ্চিন্তচক, উত্তমপুর প্রভৃতি গ্রাম— কার্পেটে হাত লাগাচ্ছে আমাদের বাংলার মহিলাকুল। মেদনীপুরের ময়না, পিংলা, সবং, পাঁশকুড়া এলাকার হাজার খানেক মহিলা কার্পেট শিল্পের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। মূলত ভদোহির কার্পেট কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ওসব মহিলারা কাজ করে। উত্তর প্রদেশের ‘ভদোহি কার্পেটস’ নামক কোম্পানীটি কনট্রাকটরের মাধ্যমে কাজ করে। ভদোহি কার্পেটের মতো আর কোম্পানী আছে এখানে। কনট্রাকটররা ভদোহি থেকে কাঁচামাল এনে দেয় গ্রামের মেয়েদের। মেয়েরা কার্পেট

বোনে। বোনা হয়ে গেলে কনট্রাকটর কার্পেট পাঠিয়ে দেয় কোম্পানীর ঘরে। কোম্পানী সেসব কার্পেট চড়া দামে রপ্তানি করে বিদেশে। আর সত্যি বলতে বঞ্চিত হয় গ্রাম বাংলার এসব ঘরোয়া শিল্পীরা। কম দাম দিয়ে শ্রমিক-শিল্পীর অভাব নেই এখানে। তাতে মুনাফা লোটে কনট্রাকটর বা কোম্পানী। আর শ্রমিক শিল্পীরা অন্ধকারেই থেকে যায়। সরকারও এদিকে বিশেষ একটা নজর দেয় না। সামাজিক সচেতনতার অভাবও দেখা যায় শিল্পীদের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, এলাকার মায়া মেটে, গৌরী মেটে, ঝর্ণা মঠ, প্রতিমা কর, ঊষা পাল, সরস্বতী আদক নামের মহিলা কার্পেট শিল্পীদের। যারা মিটার হিসাবে কার্পেট বোনে।

কার্পেট বুনতে যে সমস্থ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয় তা হল হাতুড়ি, পাঁজা, ছুড়ি, সারিয়া। লাগে সুতো ও উল। হাতুড়ি উলকে ঠুঁকে নিচে নামাতে কাজে লাগে। পাঁজা অনেকটা চিঁড়ুনির মতো, কাঠের হাতলযুক্ত। যা সুতোকে কার্পেটের গায়ে আঁচড়ে দিয়ে, উপর থেকে নিচে নামাতে সাহায্য করে। একসারি উল বোনার পর, তারপর একটা সুতো দেওয়া হয়। ওই সুতোকে পাঁজার সাহায্যে নিচে নামানো হয়। তার উপরে পরের সারির উল বোনা হয়। ছুঁড়ি লাগে উল কাটতে। সারিয়া হল অনেকটা উল বোনা ব্রুশ কাঁটার মতো। তবে কিছুটা মোটা ও বেশ লম্বা। কার্পেট বোনার জন্য কোম্পানী থেকে দেওয়া হয় ছক বা নকশা। সেই নকশা একটা বড় কাগজে গ্রাফ পেপারের মতো আঁকা থাকে (গ্রাফ পয়েন্টিঙের মতো)। অর্থাৎ কটা ঘর ছাড়তে হবে, কটা ঘর উপরে বা নিচে নামতে হবে, তা ওই গ্রাফ পেপারে পুরোটা লে-আউট করা থাকে। তা দেখে দেখে মহিলারা বুনতে থাকে কার্পেট। প্রথমে একটা বড় চারকোনা ফ্রেমে সুতোগুলো উপর থেকে নীচ বরাবর বাঁধা হয়। সেই সুতোর ফাঁকে ফাঁকে সারিয়ার সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় উল। ওই সুতোয় সারিয়ার সাহায্যে উল ঠোকানোর সময় আঙুলের বিশেষ কায়দায় সুতোর সঙ্গে উলকে ফাঁস দেওয়া হয়। ফাঁস দেওয়া হলে হাতুড়ি ঠুঁকে উলের ফাঁস দেওয়া সারিকে নিচে নামানো হয়। সেই সারি নিচে নামলে, উলের সারিকে ছুঁড়ি দিয়ে মাঝখানে কেটে দেওয়া হয়। তারপর পাঁজা ঢুকিয়ে ওই উলকে আরও নিচে নামানো হয়। যতদূর কার্পেট বোনা হয়েছে তার গায়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ওই সারির উপরে দেওয়া হয় একটা সুতোর সারি, পাঁজার সাহায্যে তা নিচে নামান হয়। তার উপরে সারিয়ার সাহায্যে নতুন উলের সারি বোনা হয়। এবং এভাবে উপরে বর্ণিত বুনন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে, যতক্ষণ না পুরো ফ্রেম ও গ্রাফের নকশা উঠছে ততক্ষণ। গোটা বিষয়টায় লাগে নিপুনতা, পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা। শিল্পীরা একটা কাঠের পাটাতনে বসে কাজটা করে। কাঠের পাটাতন মাচার মত, যাকে উপরেও ওঠান যায়। যা মোটামুটি এক মিটার উচ্চতা অবধি ওঠান হয়। তবে এভাবে বুনতে গিয়ে বারে বারে ওই গ্রাফ পেপার বা নকশাকে হুবহু অনুকরণ করা হয়। সুতোকে প্রথমেই উপর থেকে নিচে টানটান করে গাঁথার সময় সুতোর উপর কালো কালি দিয়ে ঘর গুনেগুনে পয়েন্ট করে নেওয়া হয়। তাতে শিল্পী বুঝতে পারে তাকে কত ঘর এগোতে হবে। কত ঘরের পর বুনন ছাড়তে হবে। এভাবে পুরো ফ্রেমের সুতোকে উল দিয়ে বুনে নিয়ে, শেষে কার্পেটকে ছুড়ি দিয়ে উপর থেকে ছাঁটা হয়। যাতে কার্পেটের উপর ভাগ মসৃণ হয়। এসব মহিলা শিল্পীদের হাতে কার্পেট হয়ে ওঠে নরম, গদির মতো। হয়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দিত, বিলাশিতার পরিচয়বাহী। যার এক একটির দাম হয় পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ টাকা। তবে কার্পেটের মাপ/সাইজ অনুযায়ী

তার দাম সূচিত হয়। ঝর্ণা মঠ বা উষা পালরা তৈরী করে নানা সাইজের কার্পেট। কখনও আট ফুট বাই দশ ফুট। দশ বাই চোদ্দ, নয় ফুট বাই বারো ফুট। বড় কার্পেট ছাড়া বানান হয় ছোট আসন (এক ফুট বাই এক ফুট, দু ফুট বাই দু ফুট), বসার রোল (দেড় ফুট বাই আট ফুট)। কখনও কার্পেট বুনতে গিয়ে সুতো নষ্ট হয়। মোটামুটি এক মিটার কার্পেট বুনতে গেলে কুড়ি থেকে পঁচিশ গ্রাম সুতো নষ্ট হয়। যে লেকসান শিল্পীদের থেকে থেকে মেনে নিতে হয়। পোঁকামাকড়ের হামলাও রক্ষা করতে হয়। অবশেষে কার্পেট তৈরী হলে কোম্পানীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঠায় কনট্রাকটর। কোম্পানী পাঠায় আমেরিকা ইউরোপ আরবের নানা দেশে। আয় করে ডলার। বিনিময়ে এসব শিল্পীরা সেরম কিছুই পায় না। গড়ে ওরা আয় করে হাজার চার থেকে হাজার পাঁচেক টাকা। এক একটা কার্পেট তৈরী করতে বেশ সময় লাগে। দিনের অনেকটা সময় দিতে হয় কার্পেটের পিছনে। তাই মহিলা শিল্পীদের আক্ষেপও অনেক! ওরা বলে, এটাকে কুটির শিল্পের মর্যদা দেওয়া হয়নি। ওরাও কোনওদিন শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। তাছাড়া ওদের উপর সরকারের কোনও নজর নেই। পায়না শিল্পী ভাতা, যেমনটা পট শিল্পীরা পাচ্ছে মেদনীপুরে। এটা কোম্পানীর কাজ বলে হয়ত ওদের কদর নেই। আবার ব্লক থেকে মেশিন দেওয়া হলেও ওতে, মুখ পরিচিতির ব্যাপার থাকে। এসব প্রান্তিক শিল্পীরা তাই পেটের দায়ে এ কাজটি আজও করে আসছে। অথচ সরকার বা বিদেশের ওপারের লোকেরা জানেও না কার্পেটের মহিলা শিল্পীদের বাস্তব অবস্থান কোথায়!

ব্রজবল্লভপুরের কার্পেট শিল্পী শত্রুঘ্ন মেটে, নিমাই আদকের সঙ্গে কথা হয় আমাদের। শত্রুঘ্ন, ভদোহি থেকে কার্পেট বুনন শিখে এসেছে। নব্বই এর দশকে। তারপর দেশে ফিরে এসে ২০১২ সাল থেকে শিখিয়েছে এলাকার মহিলাদের। শত্রুঘ্নর মতো মতো বহু শিল্পী এই অঞ্চলে আছে, যারা মহিলাদের মধ্যে এই শিল্পকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার উত্তরপ্রদেশে শ্রমিকের অভাব থাকায় এদেশের মেয়েরা কার্পেট বোনার কাজটি পাচ্ছে।

আমরা ওসব মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি বিশ্বের নানা দেশে যুদ্ধের কারনে কার্পেটের বাজার অনেকটাই কমেছে এখন। যুদ্ধের কারনে কার্পেটের অর্ডারে পঞ্চাশ ষাট শতাংশ কমে গেছে। কিছুদিন আগে গেছে করোনার থাবা। ফলত মহিলা শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে তলানিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এদের দিকে বিশেষ নজর দেয়, যদি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে রাজ্যের শিল্প, রাজ্যের উন্নতির সহায়ক হবে। প্রসার ঘটবে শিল্পীদলের। শিল্পের। তারই প্রতিধ্বনি প্রতিমা করের কণ্ঠে— এদিকে কার্পেটের কোনও সমিতি নেই। উত্তর প্রদেশের কোম্পানী যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের পথে বসতে হবে। আবার আমরা যে হারে পরিশ্রম করি, সে অনুপাতে পারিশ্রমিক পায়না।' বলতে গোটা পশ্চিম বঙ্গের কুটির শিল্পের অবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। ধুঁকছে বহু বহু লেকশিল্প। কিছু প।রায় অবলুপ্তির পথে। গ্রামগঞ্জের এসব শিল্পের যদি সঠিক উদ্বর্তন ঘটে, প্রসার-প্রচার করা যায়, তবে দেশেরই মঙ্গল। শিল্পের জয়। শিল্পীদের পরিশ্রম স্বার্থকতা লাভ করবে। নিচোর ছবিতে কার্পেট বোনা যন্ত্রাংশ। ডানদিক থেকে বাঁদিকে সারিয়া, হাতুড়ি, পাঁজা, দুটি ছুড়ি।